ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5
Volume- I, Issue-VI, July, 2025, Page No. 1306-1314
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711

কমলকুমার মজুমদারের ‘খেলার প্রতিভা’ উপন্যাসে লোক-উপাদান

হিমাদ্রি শেখর চক্রবর্তী, *সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ধিং মহাবিদ্যালয়, ধিং, নগাঁও, অসম, ভারত*
ড. সঞ্জয় ভট্টাচার্য, *সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, গুয়াহাটি, অসম, ভারত*

Received: 20.07.2025; Accepted: 22.07.2025; Available online: 31.07.2025
©2025 The Author(s). Published by Scholar Publications. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Kamalkumar Majumdar (1914-1979) is almost unanimously known as well as famed as one of the most mystical writers in the field of Bengali literature. Though he did not get any traditional education, surprisingly Kamalkumar accumulated a vast world of knowledge from different spheres of life. Before Independence he earned money through maritime export-import, pisciculture and spent a luxurious life. But after Independence, he changed himself into an ordinary Bengali gentleman in dhuti and panjabi. At this time, he did not have any permanent job but was busy with a variety of temporary jobs associated with arts and crafts, book illustration, literary criticism in several literary magazines and business of antiques. After getting a permanent job in South Point School as an Art & Craft teacher, he led his life in a more settled and secured way.

In the meantime, Kamalkumar got an opportunity to come in contact with the census work of the rural life and culture of Bengal which was offered by ICS Ashok Mitra in 1951. Associating himself with this census, Kamalkumar discovered the great identity of rural Bengal and in the novel ‘Khelar Pratibha’, he sketched the life of farmers with their folk culture and beliefs in the background of tidal flood-affected rural south Bengal. Though flood ruined their crops and inundated their establishments with saline water that spoiled the fertility of the soil, those poor farmers did not forget their humanities and cultural uniqueness which were their inner strength to live in this world.

In the novel ‘Khelar Pratibha’, Kamlkumar Majumdar adroitly unveiled the unshaken, invincible spirit of these sons of the soil who faced the hostile natural conditions and kept their art, culture and unique cultural identity alive in rumination, with an effortless ease. In ‘Kamalkumar Majumdarer ‘Khelar Pratibha’ Uponyase Loko-Upadan’, we are going to look into how Kamalkumar explored the folk elements in this novel.

Keywords: Kamalkumar, Khelar Pratibha, Bengal, Folk elements, Flood

বাংলা সাহিত্যে দুরূহ এবং দুর্বোধ্য লেখক হিসেবেই কমলকুমার মজুমদারের (১৯১৪-১৯৭৯) পরিচিতি। তাঁর গদ্যভঙ্গির জন্যই মূলত তাঁর এই দুর্বোধ্য অভিধা। কিন্তু এই গদ্যরীতির আপাত-শুষ্ক আশ্রয়ে যে শিল্পরস পল্লবিত হয়ে উঠেছে, রসিক পাঠকের কাছে তা অমৃত সমান। তাই নিঃসন্দেহে একথা মেনে নেওয়া যায়, “কমলকুমারের পাঠক প্রকৃতপক্ষে অভিযাত্রী ও আবিষ্কারক।”[১] প্রথাগত শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে দূরে থেকে জীবনের নানান সন্ধি থেকে জ্ঞান আহরণ করে তিনি ছিলেন তাঁর যুগের একজন শ্রেষ্ঠ স্বশিক্ষিত মননশীল ব্যক্তিত্ব। বাল্য বয়সে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, যৌবনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দেশভাগ, দাঙ্গা, স্বাধীনতা, নকশাল আন্দোলন থেকে শুরু করে ফ্রান্সের নব-উপন্যাস-

আন্দোলন– এ সব কিছুরই সাক্ষী তিনি। যেমন রামপ্রসাদ-ভারতচন্দ্র-রামকৃষ্ণ-বিদ্যাসাগর-মধুসূদন-বঙ্কিমচন্দ্রে তিনি মজেছিলেন, তেমনই ফরাসি সাহিত্যিক স্কারোঁ-প্রুস্ত-কোকতো থেকে শুরু করে নাতালি সারোৎ এবং বাংলার রবীন্দ্র পরবর্তী কবি সাহিত্যিক বুদ্ধদেব-সুধীন্দ্র-শক্তি-সুনীল পর্যন্ত তাঁর বিস্তার। স্বাধীনতার পূর্বে জাহাজে আমদানি-রপ্তানির ব্যবসা, মাছের ভেড়ির ব্যবসায় প্রচুর উপার্জন করেছেন এবং তা দুহাতে উড়িয়েও দিয়েছেন। সাহেব-সুবোদের মতন পোষাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি থেকে স্বাধীনতার পর বিবাহোত্তর জীবনে সামান্য মধ্যবিত্তের ধুতি-পাঞ্জাবিতে ফিরে এসেও যে-কোনও আড্ডার মধ্যমণি হয়ে বসা একমাত্র কমলকুমার মজুমদারের পক্ষেই সম্ভব। তাঁর সাহেবিয়ানা দেখে ফিল্ড মার্শাল মির স্মার্ট বলেছিলেন একমাত্র জিন্না আর কমলকুমার ছাড়া ভারতে এমন নিখুঁত বিদেশি পোষাক পরতে কাউকে দেখেন নি, একথা বলেছেন কমলকুমারের বোন, বিশ্বভারতীর ভিস্যুয়াল আর্টের প্রাক্তন রিডার শানু লাহিড়ী।[২] আবার স্বাধীনতার পরবর্তী সময় তাঁর পোষাকের বর্ণনা করেছেন সুনীল গঙ্গোপধ্যায়। তাঁদের নাটকের মহড়া দিতে আসা কমলকুমারকে দেখে সুনীলের প্রতিক্রিয়া,

> "যিনি এলেন তিনি একজন কুচকুচে কালো চেহারার বলিষ্ঠকায় পুরুষ, ধুতি ও পাঞ্জাবী পরা, খুব পরিষ্কার নয়, হাতে একটি চটের তৈরি র্যাশন ব্যাগ।"[৩]

'শব্দপত্র' কমলকুমার সংখ্যায় রাধাপ্রসাদ গুপ্ত সেযুগের অর্থাৎ প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে কমলকুমারের বেশ ভূষার বর্ণনা করেছেন তাঁর 'কমলকুমার মজুমদার: কিছু পুরনো কথা'[৪] প্রবন্ধে। স্বাধীনতার পর তিনি ধুতি পাঞ্জাবিতে একজন সাধারণ বাঙালি হয়ে ওঠেন। প্রকৃতপক্ষে এ সময় কমলকুমারের কোনও স্থায়ী রোজগার ছিল না। আমদানি-রপ্তানির ব্যবসার পর তিনি মাছের ভেড়ির ব্যবসা শুরু করেন। কিন্তু সেই ব্যবসাও বন্ধ হয়ে যায় পুঁজি শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে। "১৯৪৪-৪৫ নাগাদ মাছের ভেড়ির কারবার উঠে যায় মূলত পুঁজি শেষ হয়ে যাওয়ায়– বাণীর বিয়েতে মাত্রাছাড়া খরচের কারণে।"[৫] বাণী তাঁর ছোট বোন। এরপরই তিনি শুরু করেন অ্যানটিকের ব্যবসা। এই ব্যবসা করতে গিয়ে তাঁকে যথেষ্ট পড়াশুনো করতে হয়েছে। এসব ব্যবসায় বস্তুর ইতিহাস, উপাদান এবং ভাস্কর্য সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। এই ব্যবসায় তাঁর বিশেষ আর্থিক লাভ না হলেও মানসিকভাবে লাভান্বিত হয়েছেন। তাই তাঁর উপন্যাসে বারবার এসে পড়ে বিভিন্ন স্থাপত্য ভাস্কর্যের কথা। এছাড়া এ সময় ছোট ছোট বিজ্ঞাপনের জন্য কাগজে এঁকেছেন, কাঠ খোদাইয়ের কাজ করেছেন, গয়নার ডিজাইন দিয়েছেন বা 'দেশ', 'দর্পণ', 'আনন্দবাজার' ইত্যাদিতে শিল্প-সমালোচনা এবং ফিচার লিখেছেন, ললিতকলা আকাদেমিতে কবি বিষ্ণু দের সঙ্গে কাজ করেছেন। তবে আঁকা বা কাঠ খোদাইয়ের ক্ষেত্রে কোনও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তাঁর ছিল না, সে সব থেকে তেমন কিছু উপার্জনও হয় নি। তাঁর ভাই নীরদ মজুমদার এবং বোন শানু লাহিড়ী প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী। তাঁরা দুজনেই ফ্রান্স থেকে চিত্রকলা সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করেছিলেন এবং তাঁরা দুজনেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে সফল হয়েছিলেন, কিন্তু চিত্রকলায় কমলকুমারের কোনও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না, তবু তাঁর চিত্রও শিল্পবোদ্ধাদের ভাবিয়েছে। বিশিষ্ট শিল্পবোদ্ধা আশোক মিত্র বলেছেন,

> "কমলবাবু যে সমস্ত ছবি এঁকেছেন তার আকৃতি যেমন তার থেকে নীরদবাবু যে বেশি কিছু করেছেন তা মনে হয় না। নীরদবাবুর ছবিগুলো ছবিই, কমলবাবুর ছবির মধ্যে আলাদা একটা টান আছে। অথচ নীরদবাবু চিত্রবিদ্যায় শিক্ষিত, কমলবাবু স্বশিক্ষিত চিত্রকর।"[৬]

১৯৫৪ সালে সাউথ পয়েন্ট স্কুলে আর্ট এবং ক্রাফটের শিক্ষক হিসেবে যোগ দেওয়ার পরই তাঁর কিছুটা আর্থিক সংস্থান হয়। আমৃত্যু তিনি এই শিক্ষকতার কাজটি করে গেছেন। কমলকুমারেরে উপন্যাসে যে চিত্রময়তা, তার মূলে আছে তাঁর চিত্রী সত্তা। তবে এর আগে কিছুদিনের জন্য যে কাজটি কমলকুমারের মানসলোকে গভীর ছাপ ফেলেছে, তাঁকে ঋদ্ধ করেছে, সেটি হল জনগণনা বিভাগের কাজ। তৎকালীন সেনসাস কমিশনার অশোক মিত্র (ICS) কমলকুমারকে এই কাজটি দেন। আশোক মিত্র সেনসাসের কাজে শুধুমাত্র জনগণনাকে বিষয় না করে তাতে জুড়তে চাইলেন গ্রামগঞ্জের প্রাচীন বা মধ্যযুগের স্থাপত্য, তার ইতিহাস, বিভিন্ন মেলা, পূজা-পার্বণ ইত্যাদি নথিভুক্ত করতে। এর জন্য তাঁকে নতুন করে প্রশ্নপত্র সাজাতে হয় এবং বিভিন্ন গ্রামের স্থানীয় লোকেদের সাহায্য নিতে হয়। এছাড়া যাঁরা তাঁকে এই কাজে বিশেষ ভাবে সাহায্য করেছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং কমলকুমার মজুমদার। চঞ্চলকুমারের সূত্রেই কমলকুমারের সঙ্গে অশোক মিত্রের পরিচয় হয়েছিল। 'তিন কুড়ি দশ (৩য় খণ্ড)' গ্রন্থে অশোক কুমার লিখেছেন,

> "...চঞ্চল ও কমলবাবু, উভয়কে সেন্সাস সংক্রান্ত গবেষণায় লাগানোর সৌভাগ্য আমার হয়। পশ্চিমবঙ্গের স্বাভাবিক খনিজ ও অন্যান্য সম্পদ, বাণিজ্য, হস্ত ও নানাবিধ ঐতিহ্যবাহী শিল্প সম্বন্ধে তাঁরা প্রামাণ্য দলিল ও তথ্য উদ্ধার করেন। সংগ্রহ হিসাবে সেগুলি ১৯৫১ সালের সেন্সাস রিপোর্টের ১-সি খণ্ডে তাঁদের স্বনামে মুদ্রিত হয়। তাঁদের রচনাগুলি আদিম, লৌকিক, প্রাথমিক, ও দরবারি শিল্প ও শৈল্পীবিষয়ক জ্ঞানের প্রামাণ্য ভাণ্ডার হয়ে থাকবে।"[৭]

সেনসাসের কাজে জড়িত হওয়ার ফলেই কমলকুমারের হাতে সৃষ্ট হয়েছিল 'বাংলার টেরাকোটা', 'বঙ্গীয় শিল্পধারা', 'বাংলার মৃৎশিল্প', 'শোলার কাজ', 'পটকথা', 'ঢোকরা কামার'-এর মত লোকশিল্প সম্পর্কিত প্রবন্ধগুলি।

উপরোক্ত গ্রন্থে অশোক মিত্র লিখেছেন,

> "মারা যাবার কিছুদিন আগে তিনি তাঁর 'খেলার প্রতিভা' বইটি আমাকে উৎসর্গ করে আমাকে বিশেষ সম্মানিত করেন।"[৮]

'খেলার প্রতিভা' প্রথম প্রকাশিত হয় জার্নাল ৭০ জানুয়ারি সংখ্যায়, ১৯৭৭ সালে। হিরণ্ময় গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'কমলকুমার মজুমদার : জীবন ও সাহিত্য' গ্রন্থের 'কমলকুমার মজুমদার: রচনাপঞ্জি' অংশে এই গ্রন্থটি কমলকুমার শচীন চৌধুরীর স্মরণে উৎসর্গ করেছেন বলে উল্লেখ করেছেন।[৯] আমাদের মনে হয় হিরণ্ময়ের উক্ত গ্রন্থে কোনও মুদ্রণ-প্রমাদ ঘটেছে। কমলকুমার নিজস্ব শিল্পীমানসিকতার সঙ্গে সেনসাসের কাজে বাংলার পল্লীতে পল্লীতে ঘুরে যে রসদ যোগাড় করেছেন, যেসব লোক-উপাদান তাঁর অন্তর্লোকে প্রভাব ফেলেছে, তা যেন সবই উজাড় করে দিয়েছেন এই উপন্যাসে। বাংলার গ্রামীণ সমাজের মূল ভিত্তিই হল তাদের সংস্কৃতি, বিশ্বাস, ভক্তি আর সারল্য। আলোচ্য উপন্যাসটি বাংলা সাহিত্যে একটি অভিনব সংযোজন। দেশজ ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে বাঙালির বাঙালিত্ব জড়িয়ে আছে যে শিকড়ে, সেই শিকড়ের রসও তিনি নিয়ে এসেছেন এই উপন্যাসে। আমরা 'খেলার প্রতিভা' উপন্যাসের আনাচে কানাচে লোককথা, লোকসংস্কৃতি, লোকবিশ্বাসের অজস্র উপস্থিতি লক্ষ করি। এখানে যেমন ঘটনার ঘনঘটা নেই, আদৌ কোনও ঘটনাই নেই, তেমনই নেই কোনও বিশেষ চরিত্র। গোটা সমজটিই একটি চরিত্র। এখানে পাঠক কোনও চরিত্রের নাম পাবেন না, আদি-মধ্য-অন্ত্য-যুক্ত কোনও আখ্যানভাগও উদ্ধার করতে পারবেন না। বন্যা পীড়িত দুটি হাভাতে দলের খাদ্যের সন্ধানে শুধু পথ চলা এবং নেপথ্যবিধানসূত্রে তাদের জীবন-চর্যার রোমন্থন এবং ক্ষণে ক্ষণে পাপ-পুণ্যের বিচারই লক্ষিত হয় এই উপন্যাসে। এরা প্রান্তিক চাষীর দল। বাঁধ ভেঙে সমুদ্রের নোনাজল ঢুকে এদের ফসল বাসস্থান সকলই জলমগ্ন। মানুষের যে মৌলিক প্রয়োজন খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান, এই তিনটির একটিও তাদের আজ নেই। তবু তারা ভিক্ষা করবে না, এই তাদের পণ। এরা চলেছে খাদ্যের সন্ধানে। উপন্যাসটির খাঁজে খাঁজে কমলকুমার অতি সুকৌশলে প্রকাশ করেছেন তাদের মনুষ্যত্ব, যে মনুষ্যত্ব আসে তাদের আবহমানকালের সংস্কারের মাধ্যমে। প্রকৃত গ্রাম-বাংলার রূপ কী তা পাঠকের হৃদয়পটে যেন এঁকে দিয়েছেন কমলকুমার এই উপন্যাসে। হিরণ্ময় গঙ্গোপাধ্যায়কে সত্যজিৎ রায় একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, "কমলবাবুকে খুশি করার মত পল্লীজীবন নিয়ে ছবি করার ক্ষমতা আমার নেই।"[১০] সত্যজিৎ রায়ের এই স্বীকারোক্তি যথার্থ, কারণ, পল্লীজীবন নিয়ে কমলকুমারের যে অভিজ্ঞতা তা সত্যজিতের ছিল না।

'খেলার প্রতিভা' উপন্যাসে স্পষ্টভাবে কোনও স্থান বা কালের উল্লেখ নেই তবে মাতলা, বিদ্যাধরী নদীর উল্লেখ বা ভেড়ি বা বাঁধ ইত্যাদির বর্ণনা থেকে আমরা বুঝতে পারি দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার কোনও অঞ্চলের জনজীবনের আখ্যানই এ উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। "আজ এখন, হাই নীলেতে, খাসা মনোরম ঝাঁক উড়োজাহাজের, ঐ সকল জঙ্গী, তখন যুদ্ধ হয়।"[১১] এই বর্ণনার ভিত্তিতে এবং গাঁয়ের লোকেদের কোজাগরী লক্ষ্মীপূর্ণিমার সময় যাত্রা দেখায় মগ্ন বেলদারের প্রতি ভয়ঙ্কর জোয়ার আর বাঁধ ভেঙে যাওয়ার সাবধানবাণী উচ্চারণে মনে হয় কালটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কোনও এক লক্ষ্মীপূর্ণিমায় প্লাবিত হওয়ার সময়ের কথা। দেবেশ রায় বলেছিলেন, "কমলকুমার বাংলা কথাশিল্পের সেই বিরল লেখক যিনি সমষ্টি জীবনকেই তাঁর লেখার বিষয় করে তুলেছিলেন।"[১২] দেবেশ রায়ের এই উক্তি আলোচ্য উপন্যাসটি সম্পর্কে অক্ষরে অক্ষরে সত্য। পিছল পথে কাদায় পড়ে গিয়ে সেই দলের অবস্থা "একটিই তালপাকানো লোকেরা !"[১৩]

চাষীদের একদিন সুসময় ছিল। আজ তারা হাভাতে, ভেড়ির ওপর দিয়ে চলেছে কোন অনির্দেশ্য স্থানে। যাত্রাপথে ভেড়ির নিচে এক অবস্থাপন্ন বাড়ির দরজায় অন্য একটি দল তাদের শাসিয়েছে তারা যেন নিচে না নামে। সেই দলের অবস্থাও তথৈবচ। তাদের মুখে গালাগাল শুনেও এই দল সে গালাগাল ফিরিয়ে দেয় নি। এই দুর্দিনেও তারা নিজেদের মনুষ্যত্ব বিসর্জন দেয় নি।

> "তাহারা দিব্যি করিয়াছে মানুষের মর্য্যাদাকে কোনক্রমেই মার খাইতে দিবে না; যে এবং হার স্বীকার করিতে না চাহিয়া মহা অভিমানে, উপদেশিল, তোমরা মানুষের বদনাম হইতে বিরত হও, ভগবানে বিশ্বাস রাখ!"[১৪]

মানুষ এবং ভগবানের প্রতি এই বিশ্বাস আর ভক্তির ফলেই শেষ পর্যন্ত তাদের ভাত ফোটানোর সময় এক ভিখারিকে মৃত ভেবে তার লাঠি জ্বালাতে গিয়ে তাদের বিবেকে বাধে। তবু নিরুপায় হয়ে সেখানা জ্বালিয়ে যখন সকলেই পাত পেড়ে বসল, তখন সেই খঞ্জ ভিখারির আবির্ভাবে তারা সমস্ত ভাত ফেলে দেয় আর প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ সেই লাঠির জ্বলন্ত দিকটি একজন হাত দিয়ে চেপে ধরে। তারা সগর্বে বলতে পারে, "আমরা সেই। আকালেও আমরা পাপ খণ্ডন করিয়াছি।"[১৫]

যে বস্তুটির জোরে এরা এই আকালেও পাপ খণ্ডন করতে পারে তা হল তাদের মানুষের প্রতি মর্যাদাবোধ আর নিজেদের সংস্কারের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা। অতি সাধারণ ঘর গৃহস্থালীর রীতি-নীতি, পাপ-পুণ্য, পূজা-পার্বণ, ছড়া-হেঁয়ালি পূর্ণ তাদের জীবন। চাষ-আবাদকে ঘিরেই তাদের জীবন-চর্যা, জীবন-দর্শন। মাটির এত কাছাকাছি আছে বলেই "তাহারা এই মাটির প্রতিটি কণা শুঁকিতে থাকিয়া হাঁটিতে আছিল, আঃ মানুষ দারুণ কিছু, যেহেতু সে সকল কিছুর সত্ত্ব অনুকরণিবারে পারে! যে এখন তবু তাহারা তেমন কোন নকল নহে, বহু আদিম কর্ত্তব্যের উদাহরণ; তাহারা মানুষে যেমনটি তেমনটি আছে, যেমন তাহারা!"[১৬] মানুষ সব কিছুকেই নকল করতে পারে, কিন্তু এদের মাটির ঘ্রাণ গ্রহণ অন্য কোনও কিছুকে নকল করা নয়, "বহু আদিম কর্ত্তব্যের উদাহরণ"। প্রায় দশ হাজার বছর পূর্বের নিওলিথিক যুগের কৃষিকর্মের স্মৃতিই আমাদের মনে উদ্ভাসিত হয় লেখকের এবম্বিধ উচ্চারণে। এই হাভাতেরা কোনও পরিস্থিতিতেই ভোলে না যে মাটি-লাঙ্গল-চাষই তাদের ধর্ম। তাই অন্যদল এই দুর্যোগের কারণস্বরূপ নিজেদের পাপকর্ম স্মরণে আত্মবিলাপে জর্জরিত, "কাস্তের ধর্ম্মই লাঙ্গলের ধর্ম্মই আমাদের! ইহা বিস্মৃত হইলাম।"[১৭]

এই কৃষকের দল, বর্তমানে যারা হাভাতে, তাদের একটি মেয়ের চোখের বর্ণনায় লেখক বলেন,

> "আঃ কি তাহার চোখ, মধ্যপ্রাচ্যের ভূমিলক্ষ্মী! যাঁহার বরে, চামটে জমি ঝামরিয়া উঠে; সেই উর্ব্বরাবতী, উর্ব্বরদা দেবী লক্ষ্মী। ইহার নিম্নঅঙ্গ যে কোন হতাশাকে দ্রাক্ষারিষ্ট জিয়াইবে, আঃ ঐ উর্ব্বরদা দেবীর নয়নযুগলের নিকট আকাশ দাসখত দিয়াছে।"[১৮]

মধ্যপ্রাচ্যে উর্বতার দেবী হিসেবে মানা হয় দেবী ইনান্না অথবা ইশতারকে। প্রেম এবং যুদ্ধের দেবী হলেও উর্বরতা আর যৌনতার সঙ্গেও এঁর সম্পর্ক আছে। এই ভূমিলক্ষ্মীর প্রভাব পরবর্তীকালে বিভিন্ন কাম ও প্রেমের দেবী, যেমন গ্রিক দেবী এফ্রোডাইট, ফিনিশিয় দেবী আস্টারতে বা রোমান দেবী ভেনাসের ওপর পড়েছিল।[১৯]

বাংলার গ্রামের কৃষক-কন্যার চোখ মধ্যপ্রাচ্যের উর্বরতার দেবীর সঙ্গে মিলিয়ে পরক্ষণেই কমলকুমার তার চোখের সাদৃশ্য খুঁজে পান বাংলারই ভাস্কর্য এবং লোকশিল্পের মধ্যে।

> "চোখ মহাস্থানগড়ের শবরীর যেমন; কালিকাপুরের, ময়না থানা, লক্ষ্মী ভাণ্ডারের চোখ যাদৃশী ঐগুলি; ভাঁড়, মাটির তৈয়ারী, ইঞ্চি ৪/৫ উঁচু, অনেকটা জুঁইয়ের খোল; জুঁই একপ্রকার বাজী, তুবড়ী প্রকার, ইহা হাতে ধরিয়া ফুটান হয়; মোরাদাবাদী ফুলদানীর সরু ডাঁটি খানিক উঠিয়া ফুলা হইয়াছে, সাপুড়ের বাঁশী আর কি, ঐরূপ ভাঁড়ের কানায় একটি ছোট দেবী মুখমণ্ডল; পৌষ লক্ষ্মী!"[২০]

এই দলের আখ্যানে প্রসঙ্গক্রমে কমলকুমার স্থানীয় জনশ্রুতিও এনেছেন। একটি মেয়ের হাতে আয়না বসানো চুড়ি ছিল। এক ধনী মুসলমানের ছুঁড়ে দেওয়া চাল কুড়োতে গিয়ে হুটোপুটিতে তার সেই প্রিয় চুড়িটি ভেঙে যায়। সেটি কেনা হয়েছিল 'ঘুটিয়ারি শরিফ'-এর মেলা থেকে। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার

পশ্চাদভূমিতে অবস্থিত প্রধানত বাংলার ধর্মপ্রাণ মুসলমান সম্প্রদায়ের অন্যতম তীর্থস্থান ঘুটিয়ারি শরিফ। ক্যানিং থানার পূর্বতন ‘বাঁশরা’ নামের এই অঞ্চলে বসবাস করতেন ‘গাজীবাবা’ বা ‘গাজী সাহেব’ নামে খ্যাত ঐশীশক্তিধর ফকির ও মানবপ্রেমিক পীর মোবারক গাজী। জনশ্রুতি হল, সপ্তদশ শতকে সুন্দরবনের এই অংশে বেশ কয়েকমাস তীব্র খরা হওয়ার পর পীর গাজী ধ্যান করে বৃষ্টি নামান কিন্তু এই কঠোর সাধনার পরিশ্রমে তাঁর মৃত্যু হয়। এই শরিফে দুটি মেলা অনুষ্ঠিত হয়। একটি জুন মাসে অম্বুবাচীর সময় যা রাজা মদন রায় শুরু করেছিলেন। অন্যটি হয় ৩ আগস্ট পীরের মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে। এই মেলাটি প্রায় মাসব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়। এখানে শুধু মুসলমান নয়, সকল ধর্মের মানুষই এই মিলন মেলায় আসেন এবং শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।[২১] কমলকুমার লেখেন,

> “এখানে পীর সাহেব বড় জাগ্রত! এখানে ঔষধ সংগ্রহে তাহার আগমন হয়; কেননা সে হইল মৃতবৎসা! ঐ থানের মৃত্তিকা এখনও মাদুলীতে আছে।”[২২]

উক্ত উপন্যাসে অন্য একটি জনশ্রুতির উল্লেখ লোকদেবতার প্রসঙ্গে চলে এসেছে।

> “ঐ গাঙ জল, যাহাকে, তুমুল জলস্তরকে, বেচারীরা ক্রন্দিত চোখে সাবেক ভয়কাতর প্রণাম করিল; হাওয়াতে, ঐ জল, ঢেউ খেলিতে আছিল; জলে পঞ্চানন্দ প্রতিমার মুখ বিকৃত কেননা জলে নিমজ্জিত হেতু; যে মা শীতলার প্রতিমা প্রায় জলপূর্ণ! ক্ষয় হয় নাই, এখনও আছে; পাটের চুল জলে ভাসিতেছে; আদখামচা চঞ্চুদ্বয়, জলে ঢেউ হেতু এই প্রদর্শিত, এই নাই।...
>
> হায় দক্ষিণা রায়ের অদ্ভুত কল্পনার চোখ অবধি জল, এই কারণেতে, তাহার তিন চোখ, মুকুট লইয়া, জলে অস্থির প্রতিবিম্বিত।
>
> সুধাংশু রায় এ সম্বন্ধে অনেক লিখিল, মনে পড়ে তাহার সহিত দেখা মুনমোহন তলায়; ঁমদনমোহন বিষ্ণুপুরের। কারুর কিছু হাইরেছে, মদনমোহন পাইলেছে, সেই মদনমোহন।....
>
> এই মদনমোহন গোকুল মিত্রের নিকট বন্ধক ছিলেন। আদিতে, ইনি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ইষ্ট দেবতা। এই মদনমোহন গোকুল মিত্রের তামাক সাজিলেন, আবার কৃষ্ণচন্দ্রর হইয়া কোর্টে সাক্ষী দিতে যান; ভক্তের জন্য তিনি সব পারেন।”[২৩]

কৃষক-সমাজের এই মানুষগুলির বিশ্বাস-সংস্কার বেশিরভাগই কৃষি সম্পর্কিত। দলটিতে ন্যাবা (জন্ডিস) রোগাক্রান্ত যে মেয়েটির মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে, তার

> “কেশরাশি আজানুলম্বিত, তাই ইহার বড় মান ছিল, যে এবং আর এক কারণ, পাঁজী মতে আশ্চর্য্য যে, মাদাতে বীজধান ছড়াইবার সেই যোগ্যা, কেননা সে ঋতুমতী! ঐ জ্যৈষ্ঠের সকালে অনেক লাঙ্গল তাহাদের বাড়ীর সামনের আঙিনাতে, হালিকরা, হাল যাহারা করে চাষা, অতীব সন্তর্পণে আপন লাঙ্গল রাখে যাহাতে নিকোন স্থান খারাপ না হয়; সে ঘরে চালার দিকে বড় চোখ মেলিয়া ঝিল্লিরবের স্তব্ধতা অপেক্ষা করিতে আছে; পাখীদের কলরব বর্দ্ধিত হইতেছিল; সে বাসি মুখে এলোচুলে এ লাঙ্গলগুলি ছুঁইবে!
>
> আবার অম্বুবাচীর পর তেমন মাদা হইতে ধান তুলিয়া ভারে লাট দিবে, উলুধ্বনিতে সে হাসিত; এবার ক্ষেতে এলোচুলে প্রথম চারা রোপণিল! হালিকরা স্তুতিবাচক আওয়াজ করিল। জয়ধ্বনি! সেই সেই ক্ষেতে পোকা লাগে নাই, ইঁদুরের উপদ্রব কম! আবার শরৎকাল বহিয়া হেমন্ত আসিল, সে শীলনোড়াকে স্নান করাইয়াছে; শীলের উল্টো পিঠে এক ছবি; সে নারকোল কোরাইল, চাল বাটিল গুড় মিশাইল, পাখী পক্ষী পোকামাকড়, ইঁদুর, শেয়াল, চোর, মৃতদের, শত্রুকে, মেঘকে, লাঙ্গল কাস্তে টোকা বলদ, ইত্যাদিকে মা ধরিত্রীকে ও তিনজন ব্রাহ্মণের নামে সুন্দরভাবে সাজাইয়া দিল। মনিষদের কাস্তেতে, গ্রামের লোক তো বটেই, সেই হাত স্পর্শ করিল! যেহেতু তাহার আজানুলম্বিত কেশরাশি, আশ্চর্য্য পাঁজী ধরিয়া প্রকৃতি তাহাতে আসে।”[২৪]

মাটি আর ক্ষেতের সঙ্গে এদের আশ্চর্য আত্মীয়তার বন্ধন। লক্ষ্মীপূর্ণিমার সময় কোটালের জলে বাঁধের গাঁথনিতে যে বিরাট বট শিকড় গেড়েছে, সেই গাছের মাথা ঝাঁকানো দেখেই তারা বিপদের আঁচ করতে পেরেছিল। বেলদারকে তাই তারা বাঁধের অবস্থা দেখে আসার জন্য বলছিল,

> “বেলদার আজ লক্ষ্মীপূর্ণিমা মহা কোটাল আসিবে, আমাদের পৌষ সংক্রান্তিতে দেখ যেন বাধা না পড়ে, আমরা বিপদ গণিতেছি, আমাদের এমন শিরা আছে যাহা ভূমিকম্প অবধি টের পায় – মাটির নাড়ি নক্ষত্র আমরা জানি।”[২৫]

কিন্তু শেষরক্ষা না হওয়ায় তারা নিজেদের কোনও পাপাকর্ম হয়েছে কি না তা স্মরণ করতে চেয়েছে। তারা এখনও বিশ্বাস করে একদিন এই দুর্যোগ কেটে যাবে, আবার তারা বাড়ি ফিরবে, তারা বলে,

> “হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা দুটি জিনিষ মনে রাখিয়াছি, ঠাকুর এবং বাড়ী ফেরার পথ। আবার আমরা ফিরিয়া যাইব। যে ইহা বলিল, সে এক চাষাকে দেখিয়াছিল হাতের কাস্তে হঠাৎ ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে কাঁন্দিতে।”[২৬]

এই সুযোগে কমলকুমার চাষিদের বিভিন্ন ট্যাবুর প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন, যেমন –

> “কখনও ত হেলে মারিলে মুচিকে খবর করি নাই, কখনও গোসাপ বধ করি নাই, তবে কোন সে পাপ!”[২৭]
>
> “জানিও – ইহারা ভাতের দলা কখনও নাচাইয়া খায় নাই যাহা করিলে লক্ষ্মী ছাড়িয়া যায়;”[২৮]
>
> “আমরা আমাদের পুত্রের মাথায় হাত রাখিয়া শপথ করিতে পারি, আমরা জ্ঞানত কাহারেও কষ্ট দিই না, একা পথভ্রমে শ্রান্ত হইলেও কখনও উচ্চ আসনে বসি নাই, বসিব কল্পনা করি নাই; আঁধারে লাঠি ঠুকিয়া বা হাততালি দিয়া চলিয়াছি – পাছে সাপের গায় পা পড়ে, আমরা পরের ক্ষেতের জল কাটিয়া লওয়ার গল্প শুনিয়া সমস্বরে যাহারা কাটে তাহাদের ডাকিয়াছি – ও তোরা আয়, আমাদের দেশে, ছিঃ পরের আল কাটা!”[২৯]
>
> “যেহেতু লাঙ্গল জীর্ণ কাষ্ঠে আমরা রন্ধন করিয়াছি, জোয়াল দ্বারা আমরা চালা ঠেকা দিয়াছি, ভাঙা পোয়ান চক্র পদ দ্বারা মাড়াইয়াছি, কাস্তে দ্বারা আগা খুঁচাইয়াছি, কাস্তের দ্বারা প্রজ্জ্বলিত কলিকা বা কোনরূপ আগুন, খুঁচাইতে নাই, এমনও যে কাজে গরম হইলে তখন জলে দেওয়া নিষিদ্ধ – উহাতে পান নষ্ট হয়।
>
> .... এই দেহ, এই জনম মহা পুণ্যের, কোটি জনমের শেষে আমরা, হায়– আমরা নিশ্চয় ঝিনুকে দুগ্ধ পান করিয়াছি, কারণ বিবিধ। আমরা তাই রোদে দাঁড়াইয়া বহু পাপ করিলাম; যে রৌদ্রে ধান শুষ্ক হয়, হায় লাঙ্গল ভাঙ্গিলেও লাঙ্গল, কাস্তে ভোঁতা হইলেও কাস্তে, জানিবেন আমাদের বুদ্ধির খেই ঐ কাস্তেই ছিল; আপনি নিশ্চয় এই গল্প জানেন, যে গরম হওয়া কাস্তে জলে ডুবাইলে শীতল হয়, তৎপ্রবর্ত্তিত জ্বরগ্রস্তা মাকে জলে ডুবাইয়াছে!”[৩০]

‘খেলার প্রতিভা’ উপন্যাসে চাষিদের রোজনামচায় দৈনন্দিন জীবনের ছবি উঠে এসেছে। সেখানে অনেক বিধি-নিষেধ, পূজা-পার্বণ, ছড়া-হেঁয়ালি বা যাদু-বিশ্বাস কমলকুমার যেভাবে বর্ণিত করেছেন তাতে বোঝা যায়, গবেষকের দৃষ্টিতে নয়, অন্তরঙ্গ দৃষ্টিতে তিনি দেখেছিলেন তাদের জীবন-চর্যা। তাদের মহান স্বভাব জড়িয়ে আছে তাদের সরলতায়, বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে তাদের আত্মীয়তা-ভাবের সার্থকতায়। তাই তো

> “সেই এক বুড়ী যে নাতি হওয়া মাত্রই, আঁতুড় ছাড়িয়া দৌড়াইয়া যাইত, হাল ও হাল গরুর কাছে, ওগো ওগো আমার নাতি আসিয়াছে! পুকুরের কাছে, ওগো আমার অমুকের কোলে সোনার চাঁদ আসিয়াছে। ওগো ক্ষেত আমার নাতির যেন হাসি থাকে। ওগো রাস্তা আমার নাতি যেন সন্ধ্যার আগে বাড়ী ফেরে।”[৩১]

এই আকালেও এরা ভুলতে পারে না, কোনও এক সময় এরা সমৃদ্ধ ছিল, তাই নিজেদের মর্যাদা নিয়ে তারা আত্মসচেতন।

> “আমরা যাহারা ভাতে কিছু পড়িলে– ইহা সর্ব্বৈব মিথ্যা, ইহাদের খোলা মালার সংসার, এখন অভিমানে ভাবিতেছিল যে আমরা সমৃদ্ধিতে ছিলাম, ঘরে মরাই ছিল– কাঁসি সমেত কুকুরকে দিতাম; আমরা তাহারাই, যাহাদের নিমিত্ত মৎস্যসকল এক নিয়মিত সময়ে ঘাটে ওতঃপ্রোত হয়।”[৩২]

বর্তমানে তাদের স্মৃতিতে ভেসে ওঠে ঘরে জলে ডুবে যাওয়া তোরঙ্গটির কথা যার ওপরে আঁকা ছিল গোলাপ তোড়ায় টিয়া পাখি, এখন এটাতে নিশ্চয় মরচে পড়েছে। তাদের এই মর্যাদাপূর্ণ স্মৃতিই তাদের বাধা দেয় ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনে। ভিখারির ‘ধনে পুত্র লক্ষ্মীলাভ হোক’ ইত্যাদি আশীর্বচন যেন তাদের উচ্চারণ করতে নাহয় এই তাদের প্রার্থনা,

> “ঠাকুর আমরা দুঃখের খাতে বাস করিব, আমরা জন্ম জন্মান্তর বিকলাঙ্গ হইব, আমাদের পরিবারের গর্ব্বের শিশুকে আদর করিব, মেঘ ডাকিলে অভয় দিব, মেঘের আওয়াজ শিখাইব। পিতৃ ঋণের সুদ দিতে সর্ব্বস্ব খোয়াইব! কোটি জন্ম বায়ুভুক হইব। তবু আমাদের নজর হইতে তারা বিচ্যুত হইবে না, তাই তুমি কর যেন আমরা ভিখারী না হই! মহা নগরে জন্মাইব সেও স্বীকার, কিন্তু ভিখারী বৃত্তি লইতে দিও না”[৩৩]

তারা কোনওভাবেই নিজেদের সংস্কার ভুলতে পারে না। ক্ষুধা শব্দের উচ্চারণে তারা অত্মবিলাপ করে। আয়নাদার চুড়ি পরা মেয়েটিকে তারা স্মরণ করায়,

> “হে মেয়েছেলেটি, তুমি আমা সবাকার দারুণ গার্হস্থ্যে লইলে হরণ করিলে, তুমি অম্লান বদনে কহিলে, তোমার বাম স্তন ঈষৎ ছোট, উহা সন্তান সম্ভাবনায় পুরুষ্ট হয়, বুনো সীম ফুল রঙ হইল, ইহা ধুমল; তুমি আশান্বিত থাকিলে, যে মেঘ বরণ পুত্র তোমার আসিতেছে; তুমি মাঠে দঁড়াইয়া উলুধ্বনি দিলে; এবং সেই বৃদ্ধার মতন যে নাতি হওয়ার খবর দিত, প্রকৃতির সকলকে এবং দিক সকলকে ধন্য স্তন দর্শাইলে; এবং নিজের ব্রক্ষতালু হইতে সুদীর্ঘ কয়েকগাছি কেশ সংগ্রহ করত, একটি কড়ি ফুটা করিয়া, উহা পাচারিয়া আপন কোমরে বাঁধিলে!”[৩৪]

ভেড়ির নিচের দলটির কোনও একটি বাড়ির সামনে ‘ফ্যান দাও’ চীৎকার শুনে তারা কানে আঙুল দেয়। নিচের দল তাদের নিচে না নামার জন্য হুমকি দিলে ওপরের দল নিজেদের সততার রূপ এইভাবে তুলে ধরে,

> “আমরা হলপ করি, যে কাস্তে লাঙল ইত্যাদি আমরা ভুলি নাই, গৃহাভিমুখী পথ আমাদের মনে আছে; আমরা হেলে গরুর লক্ষণসমূহ ভালভাবেই জানি, আমাদের গ্রামের সকলের এ বিষয়ে হাতযশ আছে, কত ভিন্ পাড়াগ্রাম হইতে আমাদের হেলে চিনিতে ডাক পড়ে, বকনাই-হেলের তফাৎ এখনও জানি; যে হেলের ন্যাজে হাত দিলে নেতায় সে কাজের নয়, যে হাত পড়া মাত্রই চনমন করিবে সেই যুতসই; দেখ ঠিক কহিতেছি কিম্বা না; তোমাদের বিরুদ্ধাচরণ যদি তিলেক করি, তাহলে আমাদের হাঁড়ী যেন ফাটে!”[৩৫]

লোকগীত, ছড়া, ধাঁধাও বাদ যায়নি এই উপন্যাসে কারণ এই সবকিছু নিয়েই এদের জীবন-যাপন। এই চাষির দলের দলপতি প্রথমাবধি একটি লাইনের গান গেয়ে যাচ্ছিল, ‘বড় আশা করে এ পিঞ্জরে, এ পিঞ্জরে একদা…’ একটি মেয়ের জন্মগ্রামের পাল্কীবাহকেরা একটি মজার গল্প জানে, গল্পটি হল,

> “বামুন বাড়ী চোর আসিল; বামুন নিদ্রাভিভূত, চোর আপন গামছা পাতিল, চাল চুরি করিবে; হাঁড়ী হইতে চাল বাহির করে, রাখে; চাল লওয়া যখন শেষ, তখন পুঁটলি বাঁধিতে গামছার খুঁট আর পায় না, হাঁতড়াইল; বুঝিল বামুন লইয়াছে, কহিল, ঠাকুর আমার গামছাখানা দাও, তোমার চালের থেকে উহার দাম বেশী।”[৩৬]

এই চলার পথে সন্তানসম্ভবা একটি মেয়েকে নিয়ে অন্য একটি মেয়ে ছড়া কাটছিল –

> “পোয়াতি লো পোয়াতি/চুষির পায়েস খাও/ তোলা জলে চান কর, বাপের বাড়ী যাও! / ও পো’র বাপ, ত্বরা পাকুড় পোঁত গে।/ ও পো’র বাপ, কোমর বাঁধা, কাঁঠাল পোঁত গে।/ ও পো’র বাপ জলদি কর উত্তরেতে নিম দাও গে।”[৩৭]

পথে এক বুড়ির সঙ্গে দেখা, যে তাদের ভূতের গল্প বলে। তার মুখেই শোনা যায় অন্য একটি ছড়া – “আমার সাড়/ ঢেঁকির পাড়/ তারও পার!/ আমার সাড়/ ভাত মাড়/ তারও পার!”[৩৮]

দলের একটি মেয়ে একটি হেঁয়ালি বলে, “কেমন সে দেউটি/ বিনা তেলে জ্বলে,/ সোজা বা উপুড় কর জলে কিম্বা স্থলে।”[৩৯] এর উত্তর হল, পেট।

এক ঢ্যাঁড়াদারকে তার অর্ধমৃত স্ত্রী তার কাঁধে চড়ে যাওয়ার সময় বলছিল, সে তার হাঁড়িতেই চাল দিয়েছিল। হাঁড়িতে চাল দেওয়া একধরনের স্বয়ম্বর।

> "হাঁড়ীতে চাল দেওয়া অর্থ, অনেক পাত্রত যখন কোন কন্যাকে কামনা করিত, তখন কন্যাপক্ষ প্রতি পাত্রের নামে একটি করিয়া হাঁড়ী রাখিত, কন্যার চোখ বাঁধিয়া দেওয়া হইত এবং তাহার মুঠায় চাল থাকিত, এবং সে ঐ হাঁড়ির মধ্যে যে কোন একটিতে ঐ চাল ফেলিত-"[৪০]

'সুন্দরবনের লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতি' গ্রন্থে ড. গৌরী সেন লিখেছেন, "ব্যাঘ্রভীতিবশত দক্ষিণবঙ্গের সুন্দরবনের হিন্দুরা যেমন বনবিবি ও দক্ষিণরায়ের পূজা করে থাকে, তেমনি আদিবাসীদের মধ্যে বাঘাইপূজা লক্ষ করা যায়।"[৪১] গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসুর মতে "বনবিবি হিন্দুদেবী - বনদুর্গা, বনচণ্ডী, বনষষ্ঠী বা বিশালাক্ষী; মুসলমান প্রাধান্য কালে বনবিবি হয়েছেন।"[৪২] হিন্দু মুসলমান সকলেই বনের বিপদ থেকে রক্ষা লাভের নিমিত্ত এই বনবিবিকে স্মরণ করে। দক্ষিণ রায় সম্বন্ধেও গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু অনেক তথ্য তুলে ধরেছেন।[৪৩] কিন্তু স্থানীয় লোকের মন-মননে এইসব লোক-দেবতারা কীভাবে জড়িয়ে আছেন তা যেন কমলকুমারের চোখেই ধরা পড়েছে। উক্ত ঢ্যাঁড়াদারটির সঙ্গে এক লাঠিয়ালের দেখা হলে সেই লাঠিয়াল বলেছিল কোনও এক ধনাঢ্য ব্যক্তির মাতৃশ্রাদ্ধে সে মানত করে ভাত খেয়েছিল, "প্রথম গ্রাস পঞ্চানন্দ, দ্বিতীয় মা শীতলা, তৃতীয় দক্ষিণা রায়, চতুর্থ বন বিবি! পঞ্চমটি পাঁচ পীর তলা, ষষ্ঠটি পিশাচ সিদ্ধ!..."[৪৪] দেব দেবীকে মানত করার সাক্ষ্য এইভাবেই দিয়ছেন কমলকুমার।

কৃষিপ্রধান দক্ষিণবঙ্গের যে অঞ্চলে কমলকুমার সেনসাসের কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন, সে অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে মাটির সম্পর্কটি তিনি অনুভব করেছিলেন হৃদয় দিয়ে। বাংলার মূল শক্তি নিহিত এই পল্লী বাংলায়, তার আকাশে-বাতাসে, তার আবহমান কালের লোক-সংস্কৃতির মধ্যে, তার বিশ্বাস-অবিশ্বাস-অন্ধবিশ্বাসের মধ্যে। কমলকুমার মজুমদার একেই আবিষ্কার করেছেন তাঁর 'খেলার প্রতিভা' উপন্যাসে।

তথ্যসূত্র:

১. ভট্টাচার্য, তপোধীর। উপন্যাসের প্রতিবেদন। র‍্যাডিকেল ইম্প্রেশান, জানুয়ারি ১৯৯৯, কল, পৃ: ১০২।
২. মুখোপাধায়, শুভ, সম্পাদনা। সৃষ্টি বৈচিত্রের খোঁজে। প্রকাশ ভবন, ২০১৩, কল, পৃ: ১৯৩।
৩. মাজী, প্রশান্ত, সম্পাদনা। প্রতিবিম্ব (দ্বিতীয় পর্যায়), সংখ্যা ৯, মে ২০১৪, কল, পৃ: ২৮৪।
৪. মুখোপাধায়, শুভ, সম্পাদনা। শব্দপত্র কমলকুমার সংখ্যা, বর্ষ ২, সংখ্যা ১, সেপ্টেম্বর ১৯৮৪, কল, পৃ: ১-২
৫. গঙ্গোপাধ্যায়, হিরণ্ময়। কমলকুমার মজুমদার : জীবন ও সাহিত্য। লিইবার ফিয়েরা, সেপ্টেম্বর ২০২২, কল, পৃ: ৫৬।
৬. তদেব, পৃ: ৭৪।
৭. মিত্র, অশোক। তিন কুড়ি দশ, তৃতীয় খণ্ড। দে'জ পাবলিশিং, প্র প্র আষাঢ় ১৯৬০, কল, পৃ: ১৩৬।
৮. তদেব, পৃ: ১৩৭।
৯. গঙ্গোপাধ্যায়, হিরণ্ময়। কমলকুমার মজুমদার : জীবন ও সাহিত্য। লিইবার ফিয়েরা, সেপ্টেম্বর ২০২২, কল, পৃ: ৩৭১।
১০. মুখোপাধ্যায়, শুভ, সম্পাদনা। সৃষ্টি বৈচিত্রের খোঁজে, সাক্ষাৎকার। প্রকাশ ভবন, ২০১৩, কলকাতা, পৃ: ২৯৮।
১১. মজুমদার, কমলকুমার। উপন্যাস সমগ্র: কমলকুমার মজুমদার। আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০২, কল, পৃ: ৩৫০।
১২. মুখোপাধায়, শুভ, সম্পাদনা। সৃষ্টি বৈচিত্রের খোঁজে। প্রকাশ ভবন, ২০১৩, কল, পৃ: ১১০।
১৩. মজুমদার, কমলকুমার। উপন্যাস সমগ্র: কমলকুমার মজুমদার। আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০২, কল, পৃ: ৩৪৬।
১৪. তদেব, পৃ: ৪১২।
১৫. তদেব, পৃ: ৪৪৮।
১৬. তদেব, পৃ: ৩৪৬।
১৭. তদেব, পৃ: ৪১১।
১৮. তদেব, পৃ: ৩৬০।

১৯. https://www.britannica.com dt. 18/07/2025
২০. মজুমদার, কমলকুমার। উপন্যাস সমগ্র: কমলকুমার মজুমদার। আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০২, কল, পৃ: ৩৬০।
২১. উইকিপিডিয়া।
২২. মজুমদার, কমলকুমার। উপন্যাস সমগ্র: কমলকুমার মজুমদার। আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০২, কল, পৃ: ৩৪৭।
২৩. তদেব, পৃ: ৩৫০।
২৪. তদেব, পৃ: ৪০৮।
২৫. তদেব, পৃ: ৩৯৫।
২৬. তদেব, পৃ: ৩৬৭।
২৭. তদেব, পৃ: ৩৬৭।
২৮. তদেব, পৃ: ৩৮২।
২৯. তদেব, পৃ: ৩৮৬।
৩০. তদেব, পৃ: ৪১১।
৩১. তদেব, পৃ: ৩৪৮।
৩২. তদেব, পৃ: ৩৪৯।
৩৩. তদেব, পৃ: ৩৬৮।
৩৪. তদেব, পৃ: ৩৮৭।
৩৫. তদেব, পৃ: ৩৫৪।
৩৬. তদেব, পৃ: ৩৬১।
৩৭. তদেব। পৃ: ৩৭৩।
৩৮. তদেব, পৃ: ৪০৩।
৩৯. তদেব, পৃ: ৩৯৩।
৪০. তদেব, পৃ: ৪৩২।
৪১. সেন, গৌরী। সুন্দরবনের লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতি। বুলবুল প্রকাশন, ২০১৮, কল, পৃ: ৩৬৯।
৪২. বসু, গোপেন্দ্রকৃষ্ণ। বাংলার লৌকিক দেবতা। দে'জ পাবলিশিং, ৭ম সং, ২০২০, কল, পৃ: ৩১।
৪৩. তদেব, পৃ: ১৫০-১৭২।
৪৪. মজুমদার, কমলকুমার। উপন্যাস সমগ্র: কমলকুমার মজুমদার। আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০২, কল, পৃ: ৪৩৫।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. গঙ্গোপাধ্যায়, হিরণ্ময়। কমলকুমার মজুমদার: জীবন ও সাহিত্য। লিইবার ফিয়েরা, সেপ্টেম্বর ২০২২, কল।
২. বসু, গোপেন্দ্রকৃষ্ণ। বাংলার লৌকিক দেবতা। দে'জ পাবলিশিং, ৭ম সং, ২০২০, কল।
৩. ভট্টাচার্য, তপোধীর। উপন্যাসের প্রতিবেদন। র‍্যাডিকেল ইম্প্রেশান, জানুয়ারি ১৯৯৯, কল।
৪. মজুমদার, কমলকুমার। উপন্যাস সমগ্র: কমলকুমার মজুমদার। আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০২, কল।
৫. মাজী, প্রশান্ত, সম্পাদনা। প্রতিবিম্ব (দ্বিতীয় পর্যায়), সংখ্যা ৯, মে ২০১৪, কল।
৬. মিত্র, অশোক। তিন কুড়ি দশ, তৃতীয় খণ্ড। দে'জ পাবলিশিং, প্র আষাঢ় ১৯৬০, কল।
৭. মুখোপাধায়, শুভ, সম্পাদনা। সৃষ্টি বৈচিত্রের খোঁজে। প্রকাশ ভবন, ২০১৩ কল।

পত্র-পত্রিকা:

১. মাজী, প্রশান্ত, সম্পাদনা। প্রতিবিম্ব (দ্বিতীয় পর্যায়), সংখ্যা ৯, মে ২০১৪, কল।
২. মুখোপাধায়, শুভ, সম্পাদনা। শব্দপত্র কমলকুমার সংখ্যা, বর্ষ ২, সংখ্যা ১, সেপ্টেম্বর ১৯৮৪